Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 195 - 200
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 195 - 200
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

গিরিশচন্দ্রের কলমে শ্রীচৈতন্যদেব

সমাপিকা ঘোষ
গবেষক
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ghosh_samapika@rediffmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Sri Chaitanya, literature, renaissance, Bhaktiism.

Abstract
With the advent of Sri Chaitanya, individuals and society found a better culture. Along with dancing, traveling, acting, literature also became his inseparable companion. In fact, Sri Chaitanya's stream of love did not run towards any God outside the sphere of the concerned life, neglecting real life. His God resided in the individual, in society, and in life. Sri Chaitanya preached Bhaktiism not out of any deity but from a place of human tolerance and spiritual development. He played the role of social reformer. The wave of renaissance in literature came as if by the hand of consciousness. Sri Chaitanya was the pioneer of the changes that the modern age saw in the society of that time.

Discussion

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ব্যক্তি ও সমাজ পেয়েছিল এক উন্নত সংস্কৃতির সন্ধান। নৃত্যগীত, যাত্রা, অভিনয়ের পাশাপাশি সাহিত্যও হয়ে উঠেছিল তার অবিচ্ছেদ্য দোসর। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির ধারা বাস্তব জীবনকে অবহেলা করে সংশ্লিষ্ট জীবন পরিধির বাইরে কোনো ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়নি। তাঁর ঈশ্বরের বাস ছিল ব্যক্তির মধ্যে, সমাজের মধ্যে তথা জীবনের মধ্যে। শ্রীচৈতন্য কোনো দৈবনির্ভরতা থেকে নয় বরং মানব সহনশীলতা ও আত্মিক উন্নয়নের জায়গায় দাঁড়িয়ে ভক্তিবাদের কথা প্রচার করেছিলেন। অবতীর্ণ হয়েছিলেন সোস্যাল রিফর্মারের ভূমিকায়। সাহিত্যে রেনেসাঁসের ঢেউ যেন চৈতন্যের হাত ধরেই এসেছিল। আধুনিক যুগ তৎকালীন সমাজের যে পরিবর্তন দেখেছিল তার পথপ্রদর্শক ছিলেন শ্রীচৈতন্য। এই সহজ সত্যের উপলব্ধি করেই বোধ হয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন তাঁর কলমে–

> "চৈতন্যদেবের ধর্মতত্ত্ব যাই থাক, আসলে তিনি সোস্যাল রিফর্মার। রামমোহন রায়ের হাতে পড়ে যা ঘটেছে, চৈতন্য তারই সূচনা করে গিয়েছিলেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য। তিন দিক থেকে ওঁকে লড়তে হয়েছে। একদিক থেকে হোসেন শাহী ঔদার্যের পথে ইসলামের জয়যাত্রা। দেশের লোকে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছিল। চৈতন্য তাদের হাতে বাঁচবার উপায় তুলে দিলেন শুধু হরিনাম জপের সোজা রাস্তায়। অভিচার ব্যাভিচার থেকে লোকে রক্ষা পেল, পরিত্রাণ পেল 'তত্ত্বমসি'র দুর্বোধ্য শুষ্কতা থেকে। ওদিকে আচন্ডালকে কোল দিয়ে ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্ব এনে দিলেন সমাজের ভেতর। ...বাংলাদেশে চৈতন্যই প্রথম ডিমোক্র্যাসির বন্যা এনে দিয়েছেন। ...মনের

> বন্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা সাহিত্যে কী বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের উৎকর্ষই জাতির একটা রেনেসাঁসের লক্ষণ।”[১]

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই বাঙালীর জাতিসত্তা গড়ে উঠেছিল। কালসীমার গন্ডী অতিক্রম করে চৈতন্যের প্রভাব সমাজ জীবন ও কর্মকে স্পর্শ করেছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চিরাচরিত প্রথা ও কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে শ্রীচৈতন্য মানুষের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল ফলল সাহিত্যে। এতদিন সাহিত্যের বিষয় ছিল পুরাণের কাহিনী, দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক ঘটনা ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আমল থেকে বাংলা সাহিত্য দেবোপম থেকে মানবমহিমার পালা শুরু করল। নিমাইকে নিয়ে বাংলায় রচিত হল ‘চৈতন্যচরিতকাব্য’। মধ্যযুগীয় সাহিত্যিক আবহ শ্রীচৈতন্যতে যে মেতে ছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বলা বাহুল্য উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজও চৈতন্যের মায়ামোহের ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে পারেনি।

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ধারাতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পড়েছে। আধুনিক কালের সাহিত্যিকরাও মধ্যযুগীয় এই ব্যক্তিত্বের নৈতিক ভাবাদর্শ ও সমাজ মনস্কতা থেকে বেরোতে পারেননি। কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস এই তিন ধারাতেই শ্রীচৈতন্যকে বিষয়বস্তু করে কোনো না কোনো সাহিত্য রচিত হয়েছে। নাটকে যদি শ্রীচৈতন্যের কথা উল্লেখ করতে হয় তবে সেক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের নাম আসবে না এমনটা সম্ভব নয়। বলা যায়, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষই সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যকে নাটকের বিষয় করে তুললেন। গিরিশ ঘোষের পূর্বে বাংলা নাটকে চৈতন্যের উপস্থিতি সেভাবে চোখে পড়ে না। যদিও বিপরীত পক্ষে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রও এই জাতীয় মানবোপম ভাবনা নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বঙ্কিম কৃষ্ণকে সাহিত্যের বিষয় করে তুললেও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে ছিলেন নিস্পৃহ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গিরিশ ঘোষের এই জাতীয় অভিনব সাহিত্য চিন্তার পশ্চাতে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল অনেকটাই দায়ী। কারণ, যে কালপর্বে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব সেই একই সময়পর্বে বাংলার ধর্মসমাজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল উপস্থিতি। অতএব সমকালীন এমন এক ধর্মীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে অধ্যাত্ম ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল। সেই অধ্যাত্ম চেতনা থেকেই শ্রীচৈতন্য গিরিশচন্দ্রের লেখনীর আশ্রয়ে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠলেন। চৈতন্যের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচনা করলেন ‘চৈতন্যলীলা’ ‘নিমাইসন্ন্যাস’, ‘রূপ সনাতন’।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মধ্যে দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরের নাটকগুলি তিনি রামায়ণ, মহাভারতের মতো নানা পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। আর দ্বিতীয় স্তরের নাটকগুলির মধ্যে ভক্তিরসের প্রাবল্য এবং নাট্যকারের নিজস্ব ধর্মজীবনের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায়। ‘চৈতন্যলীলা’, ‘নিমাই সন্ন্যাস’, ‘রূপ সনাতন’ সেই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। নবদ্বীপের ঘটনাধারাকে কেন্দ্র করে ‘চৈতন্যলীলা’ (১৮৮৬) রচিত হয়েছে। ১২৯১ সালের ১৯শে শ্রাবণ স্টার থিয়েটারে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। নাটকের সূচনায় গিরিশচন্দ্র পুরুষ ও নারী চরিত্র স্বতন্ত্র তালিকা নির্মান করেছেন। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে তিনি জগন্নাথ মিশ্র, নিমাই, নিত্যানন্দ, গঙ্গাদাস, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, জগাই-মাধাইকে যেমন রেখেছেন, লক্ষণীয় বিষয় ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য) কেও স্বতন্ত্র চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ‘পাপের সভা’ তেই এই চরিত্রগুলির দেখা মিলেছে—

> “মোহ। কি কব জননি,
> বেড়িয়ে অবনী,
> দেখ মম প্রভাব বিস্তার,
> কাম, ক্রোধ, লোভ করে বল,
> সকলি মা আমার কৌশল। ...”[২]

স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে শচীদেবী, লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যেমন রয়েছেন তেমনি ‘পাপ’, ‘ভক্তি’-র মতো বিষয়গত ধারনাকে চরিত্রপ্রধান করে তোলা হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ অনুসরণে চৈতন্যের বাল্যলীলাকে গ্রহণ করে গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। নাট্য সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষের মতে–

> “চৈতন্যদেবের মানবীয় লীলা বঙ্গের জনসাধারণকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু নাট্যকার তাঁহাকে অলৌকিক শক্তির আধার— ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নাটকীয় কৌতূহল নষ্ট করিয়াছেন। মনে হয়

> চৈতন্যের বাল্যলীলা গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্য-ভাগবত' অনুসরণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; পাপ, কলি, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া নাট্যকার সম্ভব অসম্ভব সমস্ত সীমার পরপারে এক ধ্যানগ্রাহ্য জগতে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন।"[৩]

চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করা হেয়েছে, নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ বিদ্যার্জনের পর সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সেই ভীতিবোধ থেকে পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচী দেবী সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা নিমাইকে পুঁথিগত শিক্ষার জন্য টোলে পাঠাবেন না।

"অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাঞি।
মূর্খ হই ঘরে মোর রহুক নিমাঞি।।"[৪]

এই ঘটনার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে গিরিশের 'চৈতন্যলীলা'য়। গিরিশ লিখছেন —

"শচী। দেখ সর্ব্বনাশ!
উচ্ছিষ্ট পরশে অশুচি হইয়ে,
বিষ্ণু-সিংহাসনে
দেখ নিমাই বসেছে গিয়ে!"[৫]

গিরিশচন্দ্র কাহিনীর এই প্রথাগত দিককে অতিক্রম করেন নি। দুটি কাহিনীর পারস্পরিক তুলনা করলে দেখা যায়– গঙ্গাদাস পন্ডিতের টোলে পড়তে না দেবার জন্য নিমাই বর্জ্য হান্ডীর ওপরে গিয়ে উপবেশন করেছিল। গিরিশচন্দ্র সেই ঘটনাকেও কিছুটা পরিবর্তন করে লিখলেন নিমাই অশুচি হয়ে উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে বিষ্ণু সিংহাসনে গিয়ে উপবেশন করল। গিরিশচন্দ্র যে 'অতিথি' চরিত্রের উল্লেখ করেছেন তা আসলে 'চৈতন্যভাগবত' অনুযায়ী 'তৈর্থিক ব্রাহ্মণে'-র চরিত্র যিনি নিমাইয়ের ছলনা বুঝতে পারেননি। বিষয়ের উপলব্ধি ঘটেছে অনেক পরে। গিরিশচন্দ্র যে একজন ভক্তিপ্রবণ মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায়, তাঁর রচনার বিন্যাসগত কৌশল দেখে। দ্বিতীয়াঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে তিনি কলিকালে পাপের সঙ্গে বৈরাগ্য, ভক্তি, বিবেকের সংঘাতকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু কলিতে পাপ বিনাশের বার্তা দিয়ে নাট্যকার বলেন—

"পাপ। ওই নাম সহিতে না পারি,
ওই নাম ভয় করি।"[৬]

নাটকের পরবর্তী পর্যায়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মুকুন্দ সহ নিমাইয়ের প্রেমভক্তি প্রচারের কথা বলেছেন। যে রাধাপ্রেমে নিমাই মজে ছিল এবং নিমাই থেকে শ্রীচৈতন্যদেবে পরিণত হয়েছিল সেই ভক্তিরসের প্লাবন নাটকেও উঠে এসেছে। এই রাধাপ্রেম সমন্বিত গীতও নিমাইয়ের কণ্ঠে শোনা গেছে নাটকে –

"কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই।
দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই।। ...
বলো বলো তারে, রাধা প্রাণে মরে,
কালা বিনা রইতে পারি কই।।"[৭]

এই গানে ভক্তির প্রগাঢ়তা গিরিশচন্দ্রের অধ্যাত্ম ভাবনাকেই আরো প্রকট করে তোলে। নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের উন্মাদনার মাঝে নিমাই জাত-ধর্মের পাঠ ভুলে বামুনের ছেলে হয়ে বৃহৎ মানবতার যে শিক্ষা সমাজকে দিয়েছিল গিরিশচন্দ্র তাকেই নাটকে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচারের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জগাই-মাধাই। সে কথাও গিরিশচন্দ্র উল্লেখ করতে ভোলেননি। সংলাপে দুই মাতালের রুচিহীনতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতেও গিরিশচন্দ্র দ্বিধাবোধ করেননি - নাটকের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যায়, নিমাই বা গৌরাঙ্গ ভক্তিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে জগতবাসীকে হরিনাম বিলিয়েছেন। নিমাই তাঁর মাতার স্নেহের বন্ধন ত্যাগ করে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দেশে দেশে নাম প্রচারের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছেন। এখানে গিরিশচন্দ্র নিমাই চরিত্রে যেন সেযুগের হরিনামের উন্মাদনাকেই তুলে ধরেছেন- আশ্বিন মাসের ৫ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যলীলা দেখতে আসেন এবং বিনোদিনীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন, 'তোর চৈতন্য হোক'। এই নাটক বিদেশী দর্শককেও মুগ্ধ করেছিল–

> "তারপর এ নাটক বাঙালি দর্শকসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, দেশীয় ও বিদেশি দর্শক (কর্নেল অলকট, মাদাম ব্লাটভস্কি, ফাদার লাঁফো) এই নাটকের উচ্চ প্রশংসা করেন।"[৮]

'চৈতন্যলীলা' নাটকে শ্রী চৈতন্যদেবের যেন পুরাতন ছাঁচে আধুনিকীকরণ করা হয়েছিল। আধুনিক সাহিত্যেও যে মধ্যযুগীয় চরিত্রেকে তুলে এনে কাহিনী বয়ন সম্ভব সে কথাই যেন প্রমাণ করেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

এবার আসা যাক 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকটির আলোচনায়। গিরিশচন্দ্র যখন নিমাইয়ের জন্ম থেকে শুরু করে তার বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা ও গার্হস্থ্যলীলা অবলম্বনে সন্ন্যাস গ্রহণের ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে 'চৈতন্যলীলা' নাটক লিখে তার মঞ্চ উপস্থাপনার প্রস্তুতি শুরু করেন, ঠিক সেসময় 'অমিয় নিমাই চরিত' এর রচয়িতা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রায়শই সেই রিহার্সালে উপস্থিত থাকতেন। 'চৈতন্যলীলার' অকল্পনীয় মঞ্চ সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে শিশির কুমার শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসলীলা অবলম্বনে আরেকটি নাটক রচনার জন্য গিরিশচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং রচনাকালে চৈতন্যকেন্দ্রিক নানা তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে তাঁকে সাহায্যও করেন। চৈতন্যলীলার মতই 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকেও সঙ্গীতের প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি গানে রাগ ও তালের উল্লেখ করা হয়েছে। নাটকে গানের সংখ্যা ২৩। তবে নিমাইয়ের তুলনায় নিতাইয়ের গানের সংখ্যা বেশী। এই নাটকটি দেখতে ১৮৮৫ সালের স্টার থিয়েটারে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই রচনাটি গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় চরিত নাটক। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এবং লোচনদাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থ তিনটি গ্রন্থকে গিরিশচন্দ্র প্রধান উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ''নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের আলোচনায় পূর্ব প্রেক্ষাপট রূপে বলা যায়, 'চৈতন্যলীলা'য় গিরিশ ঘোষ নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের আভাস দিয়ে নাটকের যবনিকাপাত ঘটিয়েছিলেন। আর কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণকে কেন্দ্র করেই 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের সূচনা হয়েছে। এ যেন এক অবিচ্ছেদ্য কাহিনীর আবর্তন। নাটকের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বলে। ১৮৮৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী স্টার থিয়েটারে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। নিমাই, নিতাই, প্রতাপরুদ্র, রায় রামানন্দ, কেশব ভারতীর মতো পুরুষ চরিত্রের দেখা মিলেছে। আর নারী চরিত্রের মধ্যে অবশ্যই শচী দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, মালিনীমাতার সন্ধান পাওয়া যায়। নাটকের সূচনায় রয়েছে প্রতাপরুদ্র ও রায় রামানন্দের কথোপকথন। এই সংলাপের সূত্র ধরেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রতাপ্রুদ্রের জবানীতে নিমাইয়ের সন্ন্যাস জীবনের চরম নিষ্ঠুরতম প্রশ্নটি করেছেন –

> "প্রতাপ। ভাল রায়! তুমি কৃপা ক'রে আমার একটি সন্দেহ ভঞ্জন কর প্রভু কি নিমিত্ত বিধবা জননীর প্রতি, যুবতী পত্নীর প্রতি নির্দ্দয় হলেন, কেনই বা সে ভক্তমনোরঞ্জন নাগরবেশ পরিত্যাগ করলেন?"[৯]

নাটকের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শয়নকক্ষের দৃশ্যে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরঙ্গ কথোপকথনের ও বিরহসঞ্জাত বেদনার চিত্র রয়েছে। এখানে নিমাই চরিত্রকে গিরিশচন্দ্র প্রেমিক ও স্বামী রূপে দেখিয়েছেন। কিন্তু যদি মূলের অনুসরণ করা হয় সেখানে অবশ্য নিমাই বা চৈতন্য কোনোরকম ভাবেই বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়ে তোলেননি। বরং তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে সম্পর্কের দিক থেকে মান্যতা দিলেও হৃদয়গত দিক থেকে সেই আত্মিক সম্পর্ক কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি – যেটা ছিল প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার ক্ষেত্র। আর এখানেই যেন ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছেন গিরিশচন্দ্র। তিনি বলেছেন –

> "নিমাই। প্রিয়ে! আমি অতি নির্দয়, আহা! তোমার মনে কত ব্যাথা দিয়েছি, তুমি আবার কাঁদ কেন?"[১০]

চারটি অঙ্কে 'নিমাইসন্ন্যাস' নাটকে গৌরাঙ্গের নিমাই থেকে শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠার ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। নবদ্বীপ থেকে উড়িষ্যা সর্বত্রই চৈতন্যের প্রচারলীলাকে তুলে ধরা হয়েছে। নাম প্রচার করতে গিয়ে নবদ্বীপের মানুষজনের কাছ থেকেও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নিমাইকে। 'মাতাল', 'বজরুকী'-র তকমাও মিলেছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষও যে প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধর্ম প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিল সে তথ্য গিরিশচন্দ্রের কাছে ছিল। তৎকালীন তত্ত্ব ও তথ্যের আড়ালে গিরিশচন্দ্র তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কাজীর শাসনে নিমাইকে যে যথেষ্ট ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য এবং সাহসিকতার সঙ্গে নামপ্রচারের অভিযান চালিয়ে ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নাম প্রচার তৎকালীন নবদ্বীপবাসীর মধ্যে যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার একটি চেনা ছবি নাট্যকার তুলে ধরেছেন। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ ও পঞ্চম গর্ভাঙ্কে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহের দৃশ্য দেখা যায়। এখানে চৈতন্যের ঈশ্বরসত্তা, অবতারতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবীয় দর্শনের আলোচনা চলেছে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ আচার্য্যের মধ্যে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সার্বভৌম ভাট্টাচার্য্যের সঙ্গে চৈতন্যের 'আত্মারাম' শ্লোককে কেন্দ্র করে যে দীর্ঘ বিশ্লেষণ চলেছে তাঁকে আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্র মায়াধীন, মায়াধীশ, হ্লাদিনী, সঙ্গিনী, সম্বিৎ এই শক্তিত্রয়ের সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

"হ্লাদিনী সঙ্গিনী সংবিৎ,
শক্তিত্রয় যাহে বিরাজিত,
নিরাকার নির্গুণ সে জন
ধারণা করিতে নারে মন,"[১১]

নাটকের শেষ পর্যায়ে কেবলমাত্র বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখা যায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাইয়ের বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া কীভাবে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল সেকথা রয়েছে। প্রাণপতির দর্শন অভিলাষে তার দিনযাপন ঘটেছে। 'নিশি পোহাইল, শশী অস্ত গেল' – কিন্তু নিমাই আর ফিরল না। এই বিচ্ছেদ বিষ্ণুপ্রিয়াকে এতটাই বিচলিত করল যে সে জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলল – 'নিমাই-সন্ন্যাস' নাটকে গিরিশচন্দ্র নিমাইয়ের সন্ন্যাস পরবর্তী সময়কালের চালচিত্রকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নিমাইয়ের সন্ন্যাস কীভাবে শচী, বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে যন্ত্রণার কালো মেঘকে সঞ্চারিত করেছিল এবং সাধারণ মানুষের জীবনে সামাজিক বিপ্লব ও বৈষ্ণব সমাজে ধর্মের নৈতিক প্লাবনকে সূচিত করেছিল তাকেই গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটকের মধ্যেবর্তী পর্যায়ে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সে Climax-র সূচনা হয়েছিল, নাটকের অন্তিমে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়বেদনার হাহাকার দিয়ে তা সমাপ্ত হয়েছে। নাটকটির আনুষাঙ্গিক তথ্য হিসাবে বলা যেতে পারে, ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি শনিবার অভিনয়ের পর স্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করেন বিনোদিনী। তাঁর রঙ্গালয় থেকে বিদায় গ্রহণের পর 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের অভিনয় আর কোনো দিন হয়নি। তবে এই নাটকের মধ্যে দিয়ে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্ব মধ্যযুগের সীমা ছাড়িয়ে আধুনিক ড্রয়িংরুম কালচারে পৌঁছে গেছে।

চৈতন্যদেবের পার্ষদ তথা ষড়গোস্বামীর মধ্যে অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী। শ্রীমুকুন্দ দেবের পুত্র কুমারদেব ছিলেন পরম সদাচারী তিনি পরবর্তীকালে স্বজনগনের দ্বারা পীড়িত হয়ে নৈহাটী পরিত্যাগ করে বঙ্গদেশে 'বাকালা চন্দ্রদ্বীপ' গ্রামে এসে বসবাস করতে লাগলেন। কুমারদেব যশোরে ফতেয়াবাদ গ্রামে বাস করতেন। শ্রীকুমারদেবের তিনটি পুত্র– শ্রীরূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী সনাতন গোস্বামী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেন শ্রীবল্লভ বা অনুপম। শ্রীল কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'-র ব্রজলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামীকে 'শ্রীরূপমঞ্জরী' বলেছেন। রূপ-সনাতন রামকেলিতে যে সময় বাদশাহের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করছিলেন সে সময়েই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য তাঁর নামকীর্তনের লীলা প্রচারে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁদের যোগাযোগ ঘটে। রূপ গোস্বামীর নাম ছিল সাকর মল্লিক আর সনাতন গোস্বামীর দবির খাস নামে পরিচিত ছিলেন। এই দুই পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন চৈতন্যদেবের লীলা তথা নাম মাহাত্ম্য প্রচারের দুই স্তম্ভ স্বরূপ। নাট্যকার এই ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়েই এই দুই মহান ভক্ত বৈষ্ণবকে নিয়ে রচনা করলেন 'রূপ-সনাতন' নাটক। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক এটি। প্রথম অভিনীত হয়েছিল ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে, ১৮৮৭ সালের ২১শে মে শনিবার নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকটি উপাদান সংগ্রহে করেছেন বিভিন্ন মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে। যার মধ্যে 'চৈতন্যভাগবত', 'শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' 'ভক্তিরত্নাকর', 'ভক্তমাল' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কল্পনাকে নিজের মতো করেও সঞ্চালিত করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পাশাপাশি সনাতন, রূপ, বল্লভ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, হোসেন সাহ প্রভৃতির মতো ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি নাটকে স্থান পেয়েছে। নারী চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে রূপ, সনাতন, ও বল্লভের স্ত্রী যথাক্রমে করুণা, অলকা ও বিশাখার উল্লেখ রয়েছে। শ্রীচৈতন্যের নামপ্রচার যজ্ঞে রূপ সনাতন ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারী। রাজকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আর পাঁচজন সাধারণ ভক্তের মতো তিনি সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োজিত হতে পারেননি। আর সেই আক্ষেপ নিয়েই নাটকের শুরু। বলে রাখা ভাল, রূপ গোস্বামীর চরিত্র থাকলেও সনাতন গোস্বামী এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাই তাঁর মুখের সংলাপ দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত –

"সনা। হা গৌরাঙ্গ! দাসের পায়ে শৃঙ্খল বেঁধে রেখেছেন;
রাজকার্য্য— সংসারকার্য্য আমি কাকে দিয়ে যাব?
রূপ আমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে; বল্লভ ফাঁকি দিয়েছে; তারা সাধু।
প্রভু, তাদের কৃপা করেছেন। আমি এ বিপুল ভার কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব?..."[১২]

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের চেনা আটপৌরে ছবি নাটকটিতে রয়েছে। নাটকটির মধ্যে বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে সনাতন গোস্বামীর ভক্তি ভাবনা এবং শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ঐকান্তিক ভাবে সংযুক্ত হতে না পারার যন্ত্রণা। এই নাটকটিকে নটগুরু গিরিশচন্দ্র স্বয়ং 'প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক' নাটকের আখ্যা দিয়েছেন। নাটকের অন্তিমে গিরিশচন্দ্র রূপ গোস্বামীর রচনাপ্রতিভার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বলা যায়, শুধু চৈতন্য নয়, চৈতন্য সমকালীন মধ্যযুগীয় কোনো বৈষ্ণব চরিত্রও গিরিশচন্দ্রের রচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

সুতরাং সবশেষে বলা যায়, ঠাকুরের সংস্পর্শ বোধ হয় গিরিশচন্দ্রকে চৈতন্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। কিন্তু বৈষ্ণবীয় বাতাবরণে থেকেও একজন ব্যক্তি কীভাবে সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাঁর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। গিরিশচন্দ্র চৈতন্যের সেই লৌকিক দিকটির ওপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজ হয়ে পড়েছিল অবরুদ্ধ। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানোর কারণে অন্যান্য বিজাতীয় ধর্মের আগ্রাসন থেকে হিন্দুধর্ম বাঁচতে পারেনি। এমন সঙ্কটময় মূহুর্তে আবির্ভূত হয়ে শ্রীচৈতন্য হিন্দু সমাজকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ধর্মের ভাঙন নিচুতলা থেকে শুরু হলেও তার ঢেউ সমাজের উঁচুতলাতে এসেও পৌঁছেছে। গৌরচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন যুগগত পটভূমিকে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করতে না পারলে এই বিপন্মুক্তি সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্র ধর্মের মোড়কে শ্রীচৈতন্যের পরিণত বুদ্ধি ও দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন তাঁর রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে। এভাবেই গিরিশের কলমে শ্রীচৈতন্য যেন 'living legend' হয়ে উঠেছেন।

Reference:

১. গুপ্ত, নির্মলনারায়ণ, 'ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য', প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৬৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃ. ৩৩২
২. ভট্টাচার্য, ডক্টর দেবীপদ, কর্তৃক সম্পাদিত, গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭১, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-০৯, পৃ. ৩৭৬
৩. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস',প্রথ প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, মাঘ ১৪১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৫৬
৪. ঘোষ, বারিদবরণ, সম্পাদিত, 'বৃন্দাবনদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৭
৫. ভট্টাচার্য, ডক্টর দেবীপদ, কর্তৃক সম্পাদিত, গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭১, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-০৯, পৃ. ৩৮৫
৬. তদেব, পৃ. ৩৮৭
৭. তদেব, পৃ. ৪০৩
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', নবম খণ্ড, প্রাক্-রবীন্দ্র পর্ব, পুনর্মুদ্রণ- ২০১১-২০১২, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩
৯. ভট্টাচার্য, ডক্টর দেবীপদ, কর্তৃক সম্পাদিত, গিরিশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬৯, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-০৯, পৃ. ৩২০
১০. ভট্টাচার্য, ডক্টর দেবীপদ, কর্তৃক সম্পাদিত, গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬৯, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-০৯, পৃ. ৩২১
১১. ভট্টাচার্য, ডক্টর দেবীপদ, কর্তৃক সম্পাদিত, গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭১, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-০৯, পৃ. ৩৫১
১২. ভট্টাচার্য, ডক্টর দেবীপদ, কর্তৃক সম্পাদিত, গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭১, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-০৯, পৃ. ১৭৫